দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের তপস্যা -- ঠাকুরের আত্মিয়গণ ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি কি ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়া ওইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কিগো, এইখানে বসে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই!

চকিত হইয়া তিনি ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখনও আসন ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তোমার সময় হয়েছে। পাখি ডিম ফুটোবার সময় না হলে ডিম ফুটোয় না। যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে।

এই বলিয়া ঠাকুর মণির 'ঘর' আবার বলিয়া দিলেন।

"সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা মা বলে ডাকতাম, কাঁদতাম।ঞ্চঞ্চ

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসার আসিতেছেন। তিনি ইংরেজী পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বলতেন। কলেজে পড়াশুনা করেছেন। বিবাহ করেছেন।

তিনি কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতে, ইংরেজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি, ইওরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরেজী বা অন্য ভাষার লেকচার তাঁহার আলুনী বোধ হইয়াছে। এখন কেবল ঠাকুরকে রাতদিন দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাসেন।

আজকাল তিনি ঠাকুরের একটি কথা সর্বদা ভাবেন। ঠাকুর বলেছেন, "সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়," আরও বলেছেন, "ঈশ্বরদর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ -- একটু কল্লেই কেউ বলবে, এই এই। তুমি একাদশী করো। তোমরা আপনার লোক, আত্মীয়। তা না হলে এত আসবে কেন? কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের খুব উঁচুঘর। আর হীরানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তার ভাবটি কেমন মধুর। তাকেও দেখবার ইচ্ছা করে।

[*পূর্বকথা -- গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ -- তুলসী কানন -- সেজোবাবুর সেবা*]

"গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম। ভাবে নয়, এই চোখে! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদাচোখে সব দর্শন হত! এখন তো ভাবে হয়।

“সাদাচোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তারমধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।

“কারুকে দেখলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াই কেন জান; আত্মীয়দের অনেক কাল পরে দেখলে ওইরূপ হয়।

“মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, মা! ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে করতাম, তাই হত।

পঞ্চবটীতে তুলসী কানন করেছিলাম, জপ-ধ্যান করব বলে। ব্যাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হল। তারপরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুরবাড়ির একজন ভারী ছিল, সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।

“যখন এই অবস্থা হল, পূজা আর করতে পারলাম না। বললাম, মা, আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে; ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে; কারুকে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এ-সব মা, কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও! তাইতো সেজোবাবু এত সেবা করলে।

“আবার বলেছিলাম, মা! আমার তো আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হল। যারা যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা।”

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাস্টার সঙ্গে আছেন, আর কেহ নাই। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন।

[*পূর্বকথা -- অদ্ভুত মূর্তি দর্শন -- বটগাছের ডাল*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) -- দেখ, একদিন দেখি -- কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?

মাস্টার অবাক্‌ হইয়া রহিলেন।

তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২/১টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- এই ডাল পড়ে গেছে, দেখেছ; এর নিচে বসতাম।

মাস্টার -- আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙে নিয়ে গেছি -- বাড়িতে রেখে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- কেন?

মাস্টার -- দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- কিরকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মতো?

পেনেটীতে মহাসমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কাছে ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সংকীর্তন মধ্যে প্রেমমূর্তি দেখাইতেছেন।